২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দিবস কেন?

জহর সরকার

আজকের দিনে, অর্থাৎ 1947 সালের 20 জুন বঙ্গীয় আইনসভার বৈঠকে অখণ্ড বাংলার বিধায়করা বাংলা ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের স্মরণে ২০ জুন তারিখটিকে রাজ্য দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই — কিন্তু যখন কেউ বলে এটি কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির কৃতিত্ব, তখন তা মানা বেশ কঠিন। প্রথমেই স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে. রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) বা হিন্দু মহাসভা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি।

বরং ১৯৪২ সালের ২৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ, ফজলুল হকের বাংলার সরকারে অর্থমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাসীন হন । সেই সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জন হার্বার্টকে লেখা একটি চিঠিতে গান্ধীজির স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধতা করেছিলেন তিনি । ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কয়েক দিন আগে তিনি লিখেছিলেন, ‘‘যুদ্ধ চলার সময়ে যদি কেউ জনতার আবেগ উসকে দেওয়ার চেষ্টা করে, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়, সরকার যেন তা প্রতিরোধ করে। ব্রিটিশ গভর্নরকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, ‘‘আপনাদের একজন মন্ত্রী হিসেবে, আমি পূর্ণ সহযোগিতা জানাচ্ছি।’’

যাইহোক, স্বাধীনতা যখন আসন্ন, আর তারই সঙ্গে (যোগ করলাম) দেশভাগের কথাও চলছে, তখনও কিন্তু বাংলার বিভাজন অনিশ্চিতই ছিল। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দি, আর ফজলুল হকের মতো বিশিষ্ট মুসলিম নেতা-সহ অনেকে ভারতবর্ষ থেকে গোটা বাংলা প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল, হিন্দু অধ্যুষিত কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী শিল্পোন্নত এলাকা যদি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে জোটবদ্ধ না হয়, তবে স্বাধীন বাংলা কৃষিনির্ভর হয়েও পিছিয়ে পড়বে। তাঁদের এই প্রস্তাব গান্ধীজির ভালোই লাগল। তিনি তখন সোদপুরে ছিলেন । ১৯৪৭ সালের ৯ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহ ধরে তিনি শরৎ বাবু, সোহরাওয়ার্দি ও হক সাহেবের প্রতিনিধির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করলেন — এবং শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গেও কথা বললেন।

এই সময় হিন্দু মহাসভা তাঁদের সর্বভারতীয় পার্টিশন বিরোধী অবস্থান বদলে বাংলা বিভাজনের দাবি তুলল। তখন শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতার পাশাপাশি ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সভার জাতীয় সভাপতি পদেও আসীন ছিলেন।

স্বাধীনতার বছরে এপ্রিলের মাঝামাঝি হিন্দু মহাসভা তারকেশ্বরে একটি বড় সভার আয়োজন করে। এই ছোট দল (যাদের আইনসভায় কেবল একটি মাত্র আসন ছিল) শ্যামাপ্রসাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিল। ওই বছর মে মাসে শ্যামাপ্রসাদ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে চিঠি লিখে বাংলা বিভাজনের প্রস্তাব দেন । পাশাপাশি স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার বিরোধিতা করেন। কিন্তু ততদিনে কংগ্রেসের বেশির ভাগ হিন্দু নেতারাও তো এই একই কথা বলেছিলেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন হিন্দু মহাসভাকে যে একেবারেই গুরুত্ব দেননি, তা বোঝা গেল যখন ৩ জুন তিনি শুধু পণ্ডিত নেহরু, মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ আর শিখদের প্রতিনিধি সর্দার বলদেব সিংহকে নিয়ে একক বৈঠক করলেন। সেখানে তিনি ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্রের বিষয়টি চূড়ান্ত করলেন । দুদিন পরে শ্যামাপ্রসাদ খবরের কাগজ থেকে এই সংবাদ জানলেন।

এর ঠিক পরেই স্থির হল বাংলাকেও দুই ভাগে ভাগ করা হবে। অবশেষে ২০ জুন বিধানসভায় বাংলার বিভাজনের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা ও চূড়ান্ত ভোটাভুটি নেওয়া হল। ১০৭ জন মুসলিমপ্রধান এলাকার বিধায়করা

ভোট দিলেন পাকিস্তান ও বিভাজনের পক্ষের প্রস্তাবে। আর ৩৪ জন ছিলেন বিপক্ষে। হিন্দু এবং অমুসলিমরাও ৫৮-২১ ভোটে বিভাজনের জন্য ভোট দিলেন এবং বললেন ভারতের সঙ্গে থেকে যাবেন। উচ্চ শ্রেণিভুক্ত অনেক হিন্দু ভদ্রলোক কিছুতেই মানতে চাইছিলেন না অবিভক্ত বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সঙ্গে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবে থাকতে হবে । তাই সকলেই পার্টিশনের পক্ষে ছিলেন — তাঁরা তখনও আন্দাজ করতে পারেননি উদ্বাস্তু সমস্যাটি কত ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক হতে পারে । সেই সহস্র কণ্ঠের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন মাত্র একজন। জোর গলায় সওয়াল করেছিলেন নিশ্চয়ই — কিন্তু এক মানে তো একই হয়।

পার্টিভিত্তিক ভোটে মুসলিম লিগ ছিল ১১৩, জাতীয় কংগ্রেস ৮৭, কমিউনিস্টরা ৩ আর হিন্দু মহাসভা ১।

কিন্তু এ কথাও সত্যি যে, দেশ ভাগাভাগির সময় সীমান্ত কমিশনের প্রধান, লর্ড র‍্যাডক্লিফকে শ্যামাপ্রসাদ অনেক প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং পশ্চিম বাংলার স্বার্থে খুব সজাগ ছিলেন। তার জন্যে অনেকেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু এর মানে এটা নয় যে তিনি না থাকলে পশ্চিমবঙ্গ হত না। ইতিহাসকে নিজের মনের মতো গড়া যায় না। আর তাও রাজনৈতিক কারণে — স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপস্থিতি ভোলানোর জন্যে।